

জগদ্বন্ধু বার্ত্তা

(জগ-জন-কল্যাণকারক ধর্ম্ম-শিক্ষা-সেবা-সংস্কৃতিমূলক সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

[দত্তপুকুর ২৪ পরগণা মহাউদ্ধারণ সদন ও শ্রীবন্ধুমন্দির নির্মাণের আলেখ্য।
নির্মাণ কমিটির দৃঢ় সঙ্কল্প ও আশা ১৯৭৯ সনের মধ্যেই নির্মাণ কার্য্য রূপায়িত
হয়, দরদী বান্ধবগণের একান্ত সহযোগিতায়]

॥ জয় জগদ্বন্ধু মিশন-ইণ্টারন্যাশনাল ॥

(পূর্ব্বতন-মহাউদ্ধারণ-মিশন)

Regd. No. S/3669 of 1959/60 under Act No. XXI of 1860 !

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তা সূচী

বার্ত্তায় আনন্দ ঃ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশন প্রাঙ্গনে বিরাট ধর্ম্মসংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বায়ক শ্রীমাখন লাল ধর (বন্ধু সুন্দরানন্দ) এর সংক্ষিপ্ত ভাষণ :—

"পরমারাধ্য শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরকে ভক্তির সংগে প্রণতি জানিয়ে, পরম প্রিয় আমার মহানামব্রত ভাই, সর্বজন পরিচিত ধর্মনেতা ডঃ শ্রীমৎ মহনামব্রত ব্রহ্মচারীকে শ্রদ্ধা ও স্বাগতি নিবেদন করি।

এই আরভ্যমান পুণ্য মন্দিরের অঙ্গনতলে সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভক্তবৃন্দকে জানাই সাদর সম্ভাষণ। মহানামব্রতজীর উপদেশনায় এবং আপনাদের ন্যায় সজ্জনমণ্ডলীর আনুকুল্যে "জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশনের কর্ম্মধারা লোককল্যাণে সার্থক হয়ে উঠুক—বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণে এইপ্রার্থনা। তাঁর উদ্ধারণলীলার তপঃস্থলীতে পরিণতি লাভ করুক—এই প্রতিষ্ঠান। জয় জগদ্বন্ধু ॥

সম্মেলনের সভাপতি ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণের তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ ও ডঃ মহানাম ব্রতজীর ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগামী জগদ্বন্ধু-বার্ত্তায় প্রকাশিত হইবে। ঐ সঙ্গে ডঃ মহানামব্রতজীকে মিশনের পক্ষ হইতে 'মানপত্র'টি অবিকল মুদ্রিত হইবে।

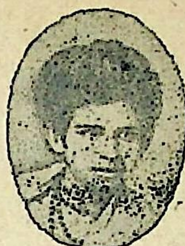
বিনীত—সম্পাদক।

জগদ্বন্ধু-বার্ত্তা

মহাপ্রচারণে ১৪শ বর্ষ

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৮০

মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৬



সম্পাদকীয় ঃ লিখেছেন ঃ সত্যবন্ধু ব্রহ্মচারী ভাগবতশাস্ত্রী

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ প্রসঙ্গ

॥ অনুবৃত্তি ॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হয়—মনে সাত্ত্বিকতা অবলম্বন এবং সর্ব্বদা ঐশ্বরিক চিন্তায় বা আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকা। কায়িক ও মানসিক চাঞ্চল্যই ব্রহ্মচর্য্য হানির এক মুখ্য কারণ। 'কাম' ও 'মনে'র সঙ্গে এত নিবিড় সম্বন্ধ যে একের বিক্ষেপে অন্য বিক্ষিপ্ত হয়। মন চঞ্চল হলে দেহ অস্থির হয়ে পড়ে; আবার দেহের কোন অঙ্গ বিকল হলে মানসিক তাপের সৃষ্টি হয়। দেহ ও মন উভয়কে প্রশান্ত রেখে সদা ব্রহ্ম চিন্তায় বিচরণ করার নামই ব্রহ্মচর্য্য পালন। ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হওয়ার মূলে নিম্নোল্লিখিত কারণগুলি বিদ্যমান। যথা:—দৈহিক ও মানসিক অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত বিষয় সংশ্লেষ। যা হতে শারীরিক ও মানসিক বিকার সৃষ্টি হয়। দার্শনিক ভাষায় যাকে মিথুন (মিলন) বলা হয়।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

[শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং

ক্রিয়া নিষ্পত্তি এই অষ্টবিধ দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকে মনীষিগণ অষ্টাঙ্গ মিথুন বা মিলন বলেছেন। মুক্তিপিপাসু ব্যক্তি ইহার বিপরীত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান আচরণ করেন।]

সাধারণ মানুষের শ্রবণ, কীর্ত্তণ, কেলি ইত্যাদি হয় পার্থিব বিষয় নিয়ে। তাই তাদের মন সর্বদা চঞ্চল থাকে। একই মনের উপর অতীব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ভিন্নমুখী বিভিন্ন বিষয়ের সংশ্লেষ থেকে মনের ঐকাগ্রিক স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার নিয়েই মনের সত্তা। জন্ম-জন্মান্তরে ইন্দ্রিয় দ্বারে স্থূল ও মানস গ্রাহ্য বিষয়পুঞ্জ সংস্কারাকারে পঞ্জীভূত হয়ে আছে এবং এই পঞ্জীভূত উপসর্জনী (অপ্রধান) চিন্তা রাশিই মনের মাঝে সূক্ষ্ম রূপ থেকে বিষয়ের উপর আকর্ষণ ও রুচি জন্মায়; তাই তো কেউ শৈশব হতে বাহ্যিক কারও প্রেরণা ছাড়া সৎ পথে চলে; আবার কাউকে বাহ্যিক প্রেরণা দিয়েও সৎ পথে আনা যায় না। এ সবই মানবের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের ফল।

ব্রহ্মচর্য্যব্রতী ব্যক্তির নিকট কায়মনে ঘ্রাণজ, ত্বাচ্, রাসনিক, শ্রাবণিক ও দার্শনিক পার্থিব বিষয়সমূহ পরিহার্য্য। এখন প্রশ্ন ওঠে এই পার্থিব পঞ্চ পদার্থকে পরিহার করলে জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় বলা যায় জীবন ধারণ করাই যায় না। সমাধান—শ্রীগুরু আদেশ সাপেক্ষে ইষ্ট সাধনার আনুকূল্য বিষয় সমূহই মাত্র পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য অন্যথা পরিহার্য্য।

শিশুর চিত্ত সংস্কার করতে হলে আর একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা অতীব প্রয়োজন। সাত্তিক বৃত্তি গঠন করতে হলে সাত্তিক আহার গ্রহণ অপরিহার্য্য। সাত্তিক আহার ব্যতিরেকে সাত্তিক বৃত্তি সংগঠন হয় না। শাস্ত্রে দৃষ্টান্ত রয়েছে;

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।
ধ্রুবাস্মৃতৌ চিত্তস্য সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

শুধু শুদ্ধ সাত্তিক ছাড়া চিত্তের গ্রন্থি মোচন এবং সত্ত্বশুদ্ধি হয় না। চব্য, চুষ্যো, লেহ্য, পেয় আহার্য্যই শরীর মধ্যস্থ পঞ্চাগ্নি দ্বারা পাক হয়ে অস্থি-মজ্জা-মেধ-মাংস ইত্যাদি আকারে রূপান্তরিত হয়। ফলে সাত্তিক আহারের রূপান্তরিত শরীরও নিঃসন্দেহে সাত্তিক হয়।

অন্যদিকে শরীর ও মনের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা আমরা একটু অনুধাবন করতে চেষ্টা করি। মাদক দ্রব্য গ্রহণ করলে মানুষ মাতাল হয়ে যায়; অনুরূপভাবে সাত্তিক দ্রব্য গ্রহণ করে মানুষ দৈবীভাবাপন্ন - দেবস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এখন প্রতিটি শিশু সাংগঠনিক সংস্থার এবং প্রতিটি পিতামাতা অভিভাবকবৃন্দের প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য শিশুর খাদ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। একদিকে যেমন শিশুর খাদ্যের উপাদেয়তা বিচার প্রয়োজন অন্যদিকে শিশুখাদ্যের সাত্তিকতা বিচারও ততোধিক প্রয়োজন।

জয় জগদ্বন্ধু আন্তর্জাতিক মিশন আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে অনাগত দিনের উজ্জ্বল ভাতি 'শিশু'র ধর্ম্মীয় সংস্কারের প্রতি সাংস্কারিক প্রতিটি ধর্ম্মীয় সংস্থানের সংস্কারকবৃন্দের এবং প্রতিটি অভিভাবকবৃন্দের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

জয় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ! জয় আন্তর্জাতিক শিশুসংস্থা !! জয় আন্তর্জাতিক শিশুর পরম ঈশ্বর প্রভু বন্ধুসুন্দর !!!

—:০:—

প্রভু বন্ধু কথা ও তত্ত্ব কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৯। আমি Sweeper এর মতন ঝাড়ু দিয়ে Purify করতে এসেছি॥

১০। Amoeba (এমিবা) দেহে Protazaয় সর্ব্বভূতে মিশে আছি॥

১১। Etherial power আমাতে আছে। তাই ইথারের উপর পরব্যোমে আমার শক্তি ও স্থিতি॥

১২। Moon Light ও আমার দেহ। আমার ইচ্ছায় দীর্ঘ ও খর্ব্ব হ'য়ে থাকে॥

১৩। অনন্ত বিগ্রহে আমার স্থিতি। তাই আমি—অনন্তানন্তময়+গুরু+প্রভু+বন্ধু+জগদ্বন্ধু॥

১৪। একান্তে যে যে পূজা, জপ, চিন্তা, প্রার্থনা করে, তা আমিই গ্রহণ ক'রে থাকি ॥

১৫। আমার আচরণ, আমার প্রচারণ, আমার কথা, আমার কার্য্য, সদাকাল সর্বাবস্থায়, লক্ষ্য ক'রে চল্‌লে কেউ তোমাদের কেশাগ্র ছুঁতে পারবে না॥

—প্রভু জগদ্বন্ধু।

কে যেন যায় (গান)

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ, ষ্টেশন মাষ্টার, দত্তপুকুর

ওরে দেখ্‌না চেয়ে ন'দের পথে
কে যেন ঐ যায়।
সে যে নিমাই পাগল কেঁদে কেঁদে
হরি নাম বিলায়॥
মুখে হরি হরি স্বরে।
সাথে অশ্রুধারা ঝরে।
বলে আয় না রে ভাই চড়ি সবাই
হরি নামের দোলায়॥
সঙ্গে আছে নিতাই মাঝি।
হাতে হরি নামের সাজি।
ঐ নামের সাজি নিবি কে কে
ডাকে শুধু আয়॥
পাপী তাপী তরিতে হায়।
সবাই গোরার পিছেতে ধায়।
হায়রে, পাগল করে সকলকে যে
ঐ পাগল নাচায়॥

বন্ধু-গীতি / শ্রীমহেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ (নিত্য সেবক)

ভজ জগদ্বন্ধু কহ জগদ্বন্ধু গাও জগদ্বন্ধু গান রে।
'হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু' বন্ধু-পরিচয়ে দান রে॥

'মনঃ প্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ' রে।
'ক্ষমা দয়া ধর্ম্মদান উর্দ্ধারবিধান' রে।
'সবে হরি নাম দান, এই কল্যাণ বিধান' রে॥

জগতের বন্ধু জগদ্বন্ধু জগজ্জীবের প্রাণ রে।
যে জন জগদ্বন্ধু ভজে, সে জন আমার প্রাণ রে॥
জগদ্বন্ধু কীর্তণে করে চির শান্তি দান রে।
জগদ্বন্ধু ভজনে হবে দিব্য জ্ঞান রে॥

মহাধর্ম মূল প্রভু বন্ধু পুরুষ প্রধান রে।
হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু কর জপ ধ্যান রে॥

প্রভু জগদ্বন্ধু ভজ, পাবে পরিত্রাণ রে।
ভুবন মঙ্গল মহানামে হবে মাঙ্গল্য বিধান রে॥

মহানামে উর্দ্ধারিবে পাপী-পাষাণ রে।
বন্ধু প্রেমদাতা জীবত্রাতা করুণা নিদান রে।
আচণ্ডালে বন্ধু মোর কোলে দেয় স্থান রে॥

প্রভু এস, দেখা দাও, কর ব্যাকুল আহ্বান রে।
প্রভু বন্ধু বিনে, এ দুর্দ্দিনে, বিশ্ব অন্ধকারে ম্লান রে।
ভজ নিত্যানন্দ জগদ্বন্ধু ওহে মতিমান রে॥

———

মহাপ্রচারণ সূচনা ও মহানাম সম্প্রদায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণলালের বাড়ী রাজবাড়ী হইতে দশ এগার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বেতামা নামক গ্রামে। এই গ্রাম মহানাম সম্প্রদায়ের পাদস্পর্শে বহুবার ধন্য হইয়াছে। কৃষ্ণলালের পিতার নাম বেণীমাধব লস্কর মহাশয় ভূম্যাধিকারী ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র। কৃষ্ণলাল ও সূর্য্য। দুইজনেই রাজবাড়ী স্কুলে পড়িত। মহেন্দ্রজীর কৃপাকর্ষণে দুই ভাই মহানাম সম্প্রদায়ে যোগদান করে। কৃষ্ণলালের নাম হয় উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী। ছোট ভাইয়ের নাম হয় জগত্তারণ। উদ্ধারণের বয়স ছিল অতি অল্প। তাহার আকৃতি ছিল দেবশিশুর মত। প্রকৃতি ছিল সর্বজন চিত্তাকর্ষক। অল্প বয়সেই মৃদঙ্গ বাদনে পটুতা লাভ করিয়া উদ্ধারণ আরতি কীর্ত্তনে তুমুল আনন্দ সৃষ্টি করিত। উদ্ধারণ দাসের পিতা লস্কর মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভুর দর্শন ভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভরের নামকরণ ভবতারণ ব্রহ্মচারী। ইনি গোয়ালন্দ হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ইঁহার পিতামাতা পরম সদাচারী ছিলেন। কখনও মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ করেন নাই। ভবতারণকে দেখিলেই বুঝা যাইত, সত্ত্ব গুণজাত, ইঁহার দেহে প্রচুর সামর্থ্য ছিল। বহু লোকের জন্য মহোৎসব রন্ধনাদি ও পরিবেশন কার্য্যাদিতে ইঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সেবাযত্ন দ্বারা সুখ বিধান করা ছিল ইঁহার চরিত্রের এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। সম্প্রদায়-নেতা মহেন্দ্রজীর আনুগত্য ইঁহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য ছিল। সতীশ মুখার্জীর জন্মস্থান হাওড়া জেলায়। ইনি মঙ্গলদাস অধিকারীর নিকট শ্রীশ্রীপ্রভুর আগমনী বার্তা শ্রবণ করেন। হাওড়া জেলার পাচলা গ্রামে বাস করিতেন পরম বৈষ্ণব মঙ্গলদাস অধিকারী। ইনি নবদ্বীপের বড় বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের কথা তুলিয়া বড় বাবাজী মহাশয় মঙ্গলদাসজীকে বলিয়াছিলেন, 'আমরা ওঁরই, ওঁরই কাজ করি, যখন যেটুকু করান।' মহাপুরুষ মুখে এই বাক্য শুনিয়া মঙ্গলদাসজী শ্রীশ্রীপ্রভুর ভাগবত্তা সম্বন্ধে বিশ্বাস সম্পন্ন হন এবং যেখানে সেখানে প্রভুর

আগমনী বার্ত্তা বলিয়া বেড়ান। তাঁহার মুখে শুনিয়া সতীশ আকৃষ্ট হয়। প্রভু ফরিদপুরে আছেন জানিয়া ছুটিয়া আসেন : রাজবাড়ীতে মহেন্দ্রজী ও যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গ পাইয়া সতীশ মহাশয় সম্প্রদায় সেবকরূপে আত্মনিয়োগ করেন। ইনি ব্রাহ্মণ কুমার। কিন্তু জাত্যাভিমান পায়ে দলিয়া কাঙাল সাজিয়া মহানাম প্রচারণে ব্রতী হইলেন। ইহার ভজন নিষ্ঠায় দৃঢ়তা ও আনুগত্য উজ্জ্বল ছিল। ইহার নামকরণ হইল সনাতন ব্রহ্মচারী।

সতীশ করের জন্মস্থান গঙ্গাপ্রসাদপুর (বেণীনগরের নিকটবর্ত্তী)। সতীশ ফুটবল খেলায় সুপটু ছিলেন। মটর ড্রাইভারী জানিতেন। সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল মৃদঙ্গে মধুর হাত। বহুক্ষণ ধরিয়া মৃদঙ্গ বাদন ও নৃত্য করিয়া ইনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। মহেন্দ্রজী যখন নিজে আরতি করিতেন তখন ইহার গলা ধরিয়া চক্রের মত ঘুরিতেন। সম্প্রদায়ে প্রথম বাদক বলিতে এই সতীশই। সতীশের নামকরণ হইল সত্য ব্রহ্মচারী। শ্রীকুঞ্জ ও শ্রীমহেন্দ্রের কোন নাম করণ হইল না। ক্রমে কুঞ্জ হইলেন কুঞ্জ দাসজী ও মহেন্দ্র হইলেন মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্রজী। অধিকাংশ ভক্তই ইহাদিগকে মহেনদা ও কুঞ্জদা বলিয়া ডাকিতেন। কেহ কেহ মহেন্দ্রজীকে পাগলদা বা শুধু দাস বলিতেন। মহেন্দ্রজী কুঞ্জদাসজীকে অনেক সময় নিকুঞ্জ সম্বোধন করিতেন।

ডক্টর শ্রীশ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী
(৮ম খণ্ড হইতে)

মহানাম সম্প্রদায় যেন একটি মহীরুহ। মহেন্দ্রজী তাহার লম্ব মূল। কুঞ্জদাসজী মূল স্কন্ধ। মহেন্দ্রজীর গভীর অনুভূতি, দুর্জ্জয় বিশ্বাস, বিশুদ্ধ প্রেম এবং অপূর্ব্ব কবিত্ব পূর্ণ গদ্য পদ্য রচনা সর্ব্বজন হৃদয়াকর্ষী। কুঞ্জ দাসজীর কণ্ঠ-মাধুর্য্য কীর্ত্তনতন্ময়তা, সদাচার নিয়ম নিষ্ঠা, মাধুর্য্যপূর্ণ প্রীতিময় ব্যবহার সকলই আদর্শ বৈষ্ণবোচিত। মহেন্দ্র প্রদীপ, কুঞ্জ কিরণ। মহেন্দ্র সঙ্গীত, কুঞ্জ সুর। দুই মিলিয়া মহানাম সম্প্রদায়ের মহাগান। এই গান ক্রমে গ্রাম, দেশ, পল্লীপাড়া ভাসাইয়া চলিল।

সম্প্রদায় গঠনের পর বেলগাছি রাখাল আচার্য্য ভবনে এবং ধাওয়াপাড়া মুকুন্দ বিশ্বাস, অতুল ঘোষ ও সুরেন্দ্র ঘোষ ভবনে অষ্টপ্রহর হয়। মহেন্দ্রজীর নির্দ্দেশে ভবতারণজী ও সুরেন্দ্র বাবু তাহার গৃহে প্রস্তুত অনেক পীঠাপানা লইয়া

শ্রীঅঙ্গনে আসেন। দয়াময় প্রভু ঐ ভোগ গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে পরমানন্দ দান করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যে শ্রীশ্রীপাদ জয়নিতাইয়ের মহানাম সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রথম সমর্থক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রচারণের সঙ্গে অনেক দিন থাকিয়া ইনি সর্বদা মহাউদ্ধারণ লীলার ভাব মাধুর্য্য পুষ্টি করিতেন। শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু সুন্দরই যে ব্রজলীলা গৌরলীলার সর্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন মহাবতারী হরি, এই সম্বন্ধে জয়নিতাই দেবের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্প্রদায়কে সঞ্জীবিত রাখিত। জয়নিতাই ছাড়া আরও অনেক প্রাচীন ও বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন। হারাণ পাঠক, করুণাময় গোস্বামী, নিত্যানন্দ দাস, সতীশ চন্দ, নিত্যগোপাল সরকার, যজ্ঞেশ্বর মাঝি, রাখাল আচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণ অনেক সময় প্রচারণের সঙ্গে থাকিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মহানাম প্রচারণ উদ্দাম গতিতে চলিতে থাকে।

পূর্বোক্ত ধাওয়া পাড়া গ্রামে মুকুন্দ লাল বিশ্বাস নামক এক দরিদ্র ভক্তের গৃহে ভোগ দিবার সময় মহেন্দ্রজী ভোগ আরতি গান রচনা করেন। কুঞ্জদাসজী সুর যোজনা করিয়া আখরাদি সংযোগে মধুর করিয়া কীর্তন করেন।

এস হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
নয়ন হৃদয়ানন্দ, পরম আনন্দ কন্দ,
প্রাণবন্ধু প্রিয়তম করহে ভোজন॥
প্রাণনাথ এস এস, বসন অঞ্চলে বস,
কুসুমাসন কোথা পাব এ মরু মাঝারে।
কাঙ্গালের ঠাকুর তুমি, কি আর দিবগো আমি,
দুঃখিনীর শাক অন্নজল লহ কৃপা করে॥

জয় জয় হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ।
আচমন কর ভাই, তাম্বুল চুয়া ত নাই,
কুড়ান এলাচি এক ধরহে অধরে॥
বুকে বুক দিয়ে থাক, পায়ে ধরি কথা রাখ,
কনক পালঙ্ক নাই দাসীর কুটীরে॥

সুখ নিদ্রা তরে নাথ কি জানি সেবন।
(আমার) অঞ্চল ব্যজনে শুধু বৃথা জালাতন॥
ভজন পূজন পটু জয় ভক্তগণ—
(প্রাণনাথে সুখে রাখ হে)
(মতিচ্ছন্নের গতি কর হে) (আমি ভজন সাধন হীন)
জয় জয় হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ॥

শাক অন্নজল সহ কৃপা করি "ইহার পরই আচমন কর ভাই" এই দুই পদের মধ্যে মহানাম কীর্ত্তন করিয়া কুঞ্জদাস প্রমুখ ভোগ গ্রহণের অবকাশ দেন, তদবধি সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে।

এই কীর্ত্তন প্রার্থনায় ও ভক্তগণের আর্ত্তিপূর্ণ আখর সংযোগে শ্রীশ্রীপ্রভু কৃপা করিয়া ভোগ গ্রহণ করিতেন। চিত্রপট বিগ্রহের নিকট ভোগ দেওয়া হইত। শেষে এমন সব চিহ্ন দেখা যাইত, তাহাতে ভক্ত অভক্ত সকলেরই অন্তরে গভীর বিশ্বাস জন্মিত যে, শ্রীশ্রীপ্রভু স্বয়ং আসিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রসাদের আস্বাদনও অপূর্ব্ব হইত। ক্রমে মহেন্দ্রজী কবিরাজ মহাশয় কুঞ্জদাসজী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীপ্রভুর রূপগুণলীলা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও আস্বাদক মহেন্দ্রজীর রচনা অতীব প্রাণস্পর্শী। তাঁহার রচিত যে সকল গান প্রায় প্রত্যহই উৎসবাঙ্গনে গীত হইত, তাহার মধ্যে একটি নিম্নে লিখিত হইতেছে—

কবে হবে দিন আসিবে সে দিন
পাপী তাপী লয়ে কোলে।
হা হা বন্ধু বলে জাতি কুল ভুলে
সকলে ঢলাব ঢলে॥

প্রতি দ্বারে দ্বারে যাব অবিচারে দীন হ'তে দীনের পারা।
নাহি আন কথা সার বন্ধু গাথা জগদ্বন্ধু জগভরা॥
আর চিন্তা নাই এসেছে রে ভাই বলব যারে কাছে পাব।
শুনুক বা না শুনুক যাচুক বা না যাচুক আগমনী গেয়ে যাব॥
প্রভু বিশ্বম্ভর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আমার বন্ধু জগদ্বন্ধু।
প্রেমের ঠাকুর রসে ভরপুর প্রাণনাথ প্রেমসিন্ধু॥

অজ ভব আদি নাহি পায় আদি অচিন্ত্য অনাদি রূপ।
(শুধু) প্রেম ভক্তি ভরে ধরা যায় তাঁরে সাক্ষী ব্রজ গোপী গোপ॥
চতুরের কাছে ছলা কলা আছে চতুরালী জানে বেশ।
লুকোচুরি খেলে থাকে অন্তরালে বিচারে কে পাবে শেষ॥
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় পরম ঈশ্বর প্রভু।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু আদি পালে তার বিধি, বিরতি নাহিক কভু॥
করণ কারণ অখিল শরণ মূর্ত্তিমন্ত বিদ্যাবেদ।
অবিদ্যা নাশিতে এল এ মহীতে ঘুচে গেল ভব খেদ॥
ওগো বিশ্ববাসী এ নহে সন্ন্যাসী "যারে চাও এই সেই।"
পরম দয়াল গৌর গোপাল মূল নারায়ণ যেই॥
ভাব রাগ ভরা প্রেমের পশরা ধরি নিজ শিরে ডাকে।
অবিচারে দেয় বিনা মূলে হায় কেন পড়ে থাক ফাঁকে॥
উদ্ধার বিধান হল এতদিনে আয়রে কে কোথা আছিস।
বিলম্ব কি সাজে হের ব্রজরাজে পেয়ে বন্ধু কেন ভুলিস॥
(দীন মহেন বলে) (আর ভুলিস নে ভাই)

এই গান শুনিয়া নরনারী আকুল হইত। মহেন্দ্রজীর সঙ্গে কুঞ্জদাসজীর সুকণ্ঠে সুর ও আখর যোজনায় এই গানে বন্ধুসুন্দরের তত্ত্ব, ভজন রহস্য ও মহানাম সম্প্রদায়ের প্রচারণের মূল কর্ম্ম প্রকটিত হইয়া উঠিত। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিত, কাঁদিত, আনন্দে ভাসিয়া যাইত।

শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতের মন্ত্রাবলী উপচিতি

(১)

শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত নামক ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থটি বিশেষ রহস্যময়। সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচন সহজসাধ্য নহে। কারণ রচনার ভাষা দুর্বোধ্য। যে সব পদ নিয়ে শ্রীশ্রীচন্দ্র-পাত রচিত, প্রত্যেকটির গূঢ় অর্থ মন্ত্র ঘেঁষা বলা চলে। "চন্দ্রপাতকে কীর্ত্তন

কহে"—শ্রীশ্রীপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করে তান লয় মানে এই গ্রন্থের বন্দনাই একমাত্র পথ। "আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী"—মহানাম সম্প্রদায়ের পক্ষেও এই নীতি পালনীয়। তথাপি শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতের আক্ষরিক অর্থগুলো উদ্ধার করা গেল না বলে গ্রন্থের মূল্য কিছুই শেষ হয় না। আশ্চর্য্য এই যে দ্ব্যক্ষর ত্র্যক্ষর এমন কি শুধু এক বর্ণাত্মক পদ নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটি অপূর্ব্ব ভাব বিস্তার করতে সমর্থ। কয়েকটি রাগ রাগিনী সম্বলিত যে সুরের ঝঙ্কার প্রাণে দোলা জাগায়, তার মাধুর্য্য সারাৎসার—স্বর্গীয়। সুর ও তাল সহযোগে শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত কীর্ত্তনে ভাগবতী সাধনার মাধ্যমে তিন তিনটি লীলার যবনিকাপাত—'বৃন্দাবন নদীয়া আঙ্গিনা' এই তিন লীলা রহস্যের অবতারণা, আস্বাদন ও সংবরণই এই গ্রন্থটির মর্ম্মার্থ। একটি বিশেষ ভূমিকায় গ্রন্থটির পর্য্যালোচনা হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু লীলার সামগ্রিক রূপরেখা তো বিশাল প্রমাণ। কিন্তু শ্রীহরিপুরুষের লীলা সংবরণ কালে কালে নিঃশেষিত হয় না। এই বাণীটি স্মরণ করেই 'মহাউদ্ধারণ' তত্ত্বে প্রবেশ করা যায়। ঐ যে শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতে—

১। "পঞ্চম বর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাসে
তাপ ত্রাস পাত পাশ কীট পাশে আসে॥
(কীট কীট কীটরে) (হরি পাত করিলি রে)॥

২। "হাত হায় যায় যায় প্রলয় পায়।
তায় থায় দায় ধায় বন্ধু পাই যায়॥
(হরি হরি হরি কও) (মহানাম মহানাম)॥

৩। "কৃতি মতি হও, হরি হিতে রও,
আত্মশুচি উদ্ধারণে।
এক তেক তত্র বতা অতা বক্ত
এ রক্ষণ উচ্চারণে॥
তায় রয় লয় তায় ভেয় ভয়
বতী ভতী বিভারণে।
অমঙ্গ মঙ্গঙ্গ এ ব্যাঙ্গ রজঙ্গ
গতি গীতি বিধায়নে॥"

মৃত্যুঞ্জয়ী হরি নামামৃত মদিরা বিলাতেই শ্রীশ্রীপ্রভু এসেছেন। সে দিক দিয়ে এ গ্রন্থ অমৃত রসময়। গ্রন্থের রাগ রাগিনীর সংজ্ঞা ও বস্তু নির্দ্দেশ রচয়িতা স্বয়ংই যথাবৎ নির্দেশ করেছেন।

কোথাও পয়ার কোথাও ত্রিপদী ছন্দে এই গীতিকা সন্নিবেশিত। একমাত্র শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুই এ প্রকার ভাব ভাবনা, ভাষা ও ছন্দের আধার বলা যায়। সাধক ভক্তগণ এই গ্রন্থকে অপ্রাকৃত রচনা বলে অভিহিত করে থাকেন। ইহা অপ্রাকৃত জগতের এক অতি বাস্তব অবদান। বিশেষতঃ শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীও এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, এই শ্রীগ্রন্থই আচার্য্য মহেন্দ্রজীর প্রাণমন্ত্র। শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতই মহানাম সম্প্রদায়ের প্রেরণার উৎস। অধিক কি জীব ও ঈশ্বরের সেতুবন্ধন যেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। সূচনায় শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর অপূর্ব উক্তি আহরণ করা উচিত ছিল। প্রবন্ধের এই অংশে তাঁর সেই উক্তি উল্লেখ করছি। জগন্মঙ্গল হরিনামের বিমুর্ত প্রতিচ্ছবি শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের পরম করুণার দান বলে আখ্যাত করেছেন মহেন্দ্রজী এই গ্রন্থকে। ইঙ্গিতটি এইরূপ :—

"তীরে কীট যত স্রষ্টা সৃষ্ট শত,
কেবল ও কুহক ও ঐশ্বর্য দ্বন্দ্ব।
কারুণ্যে ক্ষণে ধন্যা সুধা ঘন,
চন্দ্রপাত শীতল অমৃতচ্ছন্দ॥"

বন্ধুনিষ্ঠ ভক্ত বান্ধবগণ, মরণোত্তর আশ্বাস পেয়ে মরণজয়ী হরিনাম মহানাম নির্দ্দেশিকারূপে শ্রীগ্রন্থ চন্দ্রপাতের সেবা করেন। 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ' মুল মন্ত্রকে তাঁরা তদ্‌গতচিত্তে গ্রহণ করছেন—শ্রীশ্রীচন্দ্রপাত তাই তাঁদের সমাদরের আগ্রহের বস্তু। তন্ত্র দীক্ষা নিরীক্ষার আর কোন অপেক্ষাই তাঁরা করেন না। তাঁরা চন্দ্রপাত গান করবেন, কেননা মহেন্দ্রজীর গানের ভাষায়—

"জীবন - মরণ সাথী, তোমারই স্মরণ গীতি
গাহি মনে আশ অনুক্ষণ।"
(দৈন্য বোধিকা)

(২)

আমাদের বেদ উপনিষদ শাস্ত্র পুরাণ অনুসন্ধান করলে একটি বিষয় সহজেই দৃষ্টি গোচর হয়, সেটি হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ রচনার মূল

কারণ। শ্রদ্ধা মনুষ্যের ন্যায় উচ্চ স্তরের প্রাণীর একটি স্বভাবগত বা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম বা সদ্‌বৃত্তি বলা যায়। শ্রদ্ধা ব্যতীত কারও প্রতি অপর কারও আকর্ষণ হতে পারে না। শ্রদ্ধার অভাব বিপর্যয়ের সূচনা করে। শ্রদ্ধার বিনাশে প্রলয়ের অঙ্কুর দানা বাঁধে। যাক্—এক্ষণে শ্রদ্ধাই আলোচ্য। শ্রদ্ধার চেয়ে ভক্তি আরো দূর অগ্রসর। শ্রদ্ধা সহজ ও স্থায়ী হলেই তাকে ভক্তির পর্য্যায়ে ফেলা যায়। অনেকে এরূপ বলে থাকেন যে ভক্ত যদি না থাকে অর্থাৎ ভক্তের ভক্তি যদি না মিলে তবে ভগবানকে ভাবাই যায় না। কথাটি আরও সুস্পষ্ট হয় যদি বলা হয় যে ভক্তই ভগবানকে ভাবেন। ভগবানকে ভাবা কিছু দুষ্কর কিছু তুচ্ছ মোটেই নয়। সনাতন হিন্দু ধর্মে সৃষ্টির অণু-পরমাণুকে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর মহাবানী—"অণু-পরমাণুকে পর্য্যন্ত রসাস্বাদন করাইব, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

লেখক—শ্রীকালী মোহন চক্রবর্ত্তী, সল্‌ট লেক, কলিকাতা-৬৪

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত রূপের বৈচিত্র্য। অনন্ত ক্রীড়ায় যা কিছু বিরাট ও মহান, সে সকলের পশ্চাতে শ্রীভগবান সর্বশক্তিধর এটি ভাবা তো স্বাভাবিক। কিন্তু যা কিছু ক্ষুদ্র সামর্থ্য তুচ্ছ, তার উৎসটি এক ছাড়া আর নয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম:" আমরা এখন পশ্চাদ্ধাবন করছি। অর্থাৎ আমরা ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থী। আমরা শ্রীভগবানকে পেতে চাই। কিন্তু শ্রীভগবানকে আমরা কি শুধু নির্গুণ নিরুপাধি জ্ঞানে পেতে চাই? যিনি সর্ব্বাশ্রয় তিনি যদি রূপহীন অব্যয় অনাদি, অচিন্ত্য, তিনি যদি রূপময় ভাবময় গুণময় মঙ্গলময় হয়ে দেখা না দেন তবে তিনি সর্ব্বাচিত্তোন্মাদী হবেন না। অচিন্ত্য অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বরকে আমরা নরাকার ঈশ্বররূপে পেতে চাই। নররূপী নারায়ণই সর্ব-চিত্তাকর্ষী হবেন। তিনি সর্বভাবোল্লাসী—তিনি কেন আমাদের ভাবনায় উদিত হবেন না? একটি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—জল ও সাগর, জল সাগর নয় কিন্তু। দৃষ্টান্ত—জলময় সাগর বা সাগরের জল। সৃষ্ট জলের উৎস আধার এবং গতি সাগরই। আবার জলেরই সাগর। অর্থাৎ কিনা বিরাট জলরাশি নিয়ে সাগর হল ভগবানের দৃষ্টান্ত এবং প্রতিটি জলকণা. ব্যষ্টিগত অনন্ত সৃষ্ট বস্তু। নিজ বাসভূমিতে কূপোদকে স্নান করলেও আসলে কিন্তু সাগর সলিলের স্পর্শ

পেয়েছেন। কথাটি সকলেই জানেন। অসদ্ বস্তুকে ভাবা যায় না। ভাবনার বস্তু সদ্ বস্তু। সদ্ বস্তুর অভাব কিসে? আমরা এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রশ্ন তুলেছি। জলকণা ও জলাকীর্ণ সমুদ্রের দৃষ্টান্ত ছেড়ে নরলীলায় আসা যাক। দেখা যাক ভাব ও ভাবনার মহাসমুদ্রের পরিধি ও গভীরতা। নর জন্ম ধারাবাহিক বংশরক্ষা ছাড়া অধিক কিছু নয়, এটি হতেই পারে না। কারণটি হচ্ছে এই যে শ্রদ্ধা। ঐ যে শোভা। ঐ যে জন্মলীলা ঐ যে মরণ। শ্রদ্ধার প্রকাশ স্নেহে ভালবাসায়, এমন কি নিত্যকার সম্পর্কে দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে এই শ্রদ্ধা ক্রিয়াশীল। সমাজ চেতনায়ও শ্রদ্ধা ক্রিয়াশীল। আমরা জাগতিক সত্যকে বিশ্বসৃষ্টির আভাষিক দান বলেই জানি। সত্যের সামগ্রিক রূপময়তা খণ্ডিত দেশে কালে নিশ্চিতই অংশতই অংশতঃ। খণ্ডিত বলেই অখণ্ডের দ্যোতনা, অপূর্ণ বলেই পূর্ণের আকর্ষণ, আকুলতা। এই ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাই জাগ্রতা। মায়াময় ঐহিক লীলায় আর মায়াতীত বিশ্বলীলায় শ্রদ্ধা তার আসন পেতে বসে আছেন। এবারে প্রশ্ন হ'ল এই শ্রদ্ধা ভালবাসা ভক্তি কিসের জন্যে; এগুলি কেনই বা জীবনের মূলধন? লেখকের ধারণা—এ সবই ঈশ্বরের দান, ঈশ্বর নিজ হস্তে এ সব বীজ বপন করেছেন। লেখকের ধারণা ঈশ্বরের গুণময়তা ও গুণপ্রাচুর্য্য বিশ্বজগতে আরোপিত রয়েছে। সর্ব্বগুণাধার ঈশ্বরই কিন্তু এ সবের ভোক্তা ও আস্বাদক। অনন্ত জীবন ও অনন্ত মৃত্যু নিয়ে এক অবিনাশী অব্যয় সত্য বিরাজ করছে। স্পষ্টতঃ পরম পুরুষ শ্রীহরিই বিশ্বে নিজ লীলাগুণে লীলাময় সন্দেহ নেই। তিনিই নরলীলায় শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবে স্বমাধুর্য্য আহরণ করছেন। এই লীলা মাধুর্য্যকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। ভক্তিতে সুদৃঢ় করতে হবে। সাধক কোন্ সত্যে উপনীত হবেন তারপর—সাধক তখন রতি ও প্রেমের পুণ্যলোকে উত্তীর্ণ হবেন। সমস্যা এখানেই শেষ নয়। আহরণ ও সংহরণ দ্বিবিধ সমস্যা। সৎ ও অসৎ, সত্য ও অসত্য, সৃষ্টি ও প্রলয় ইত্যাদি সংঘাত অনিবার্য্য। আহরণে শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমের আবেশ; সংহরণে প্রলয় সংলয় লয়—সর্ববিধ ভাবের অথবা অভাবের সম প্রকৃতি সম উদ্ধারণ। ঈশ্বর কল্পনায় এই লীলাই মহাউদ্ধারণ লীলা।

(৩)

এক পূত পুণ্য বাণীই শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতের মর্ম। সেই মর্ম উদ্ধারে বিমুখজন

বঞ্চিত। তার মর্ত্য জীবন তুচ্ছ। মনুষ্য চেতনায় ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নষ্ট হলে সে মনুষ্য কীট স্বরূপ কবলিত। পরা প্রকৃতির গুণে পরা ভক্তিই অন্বিষ্য। শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাউদ্ধারণ লীলায় স্বরূপ ভ্রষ্ট জীব চেতনার কীটত্ব পাণ্ডিত্ব দূরে যাবে। প্রকট লীলায় পরম পুরুষ স্বয়ংই পাবনী শক্তির আহ্বান করছেন। শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতেই এই আবাহন—ইমন কল্যাণ রাগে ও সংকীর্ত্তনে এর সূত্রপাত শক্তির ত্রিবিধ প্রকট রহস্য শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতে মূর্ত, মূর্চ্ছনা পেয়েছে—এইত শেষ নিবেদন।

শক্তির ত্রিবিধ রূপ সহজবোধ্য। যা হচ্ছে সৃজনী, পালনী ও প্রলয়-কারিনী। যেখানে সৃষ্টি বিষ্ণু বিরোধী, সেখানে 'বিষ্ণু বিষ্ণু উচ্চারণই কাম্য। যেখানে পালনী শক্তি পরাভূতা, সেখানেই প্রলয়। যেখানে অনাসৃষ্টি অনাচার অধর্ম অসদ্‌বৃত্তি সেখানেই মহারুদ্র মহাশিব ডম্বরুনাদে তাণ্ডব নৃত্যে পাপাশ্রিতা সৃষ্টি ও সৃষ্ট বস্তুকে মহাপ্রলয়ের কুক্ষিগত করবেন। পরম পুরুষের রসবৈভব ক্ষীয়মান হতে পারে না। তাই মহা প্রলয় যুগেও ক্ষীণ শূন্য দুঃখময় জীবলোকে মহানিশা যুগেও হরিনামের মহিমা উদ্গীত হল—ষোল কলা পূর্ণ চাঁদের মায়া ভাষা পেল। "যো রসে ভাসি আশ মহীমণ্ডল, গোবিন্দ দাস তহি পরশ না ভেল।"

যিনি ভক্তি রতির গান গেয়ে, শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম মধুরিমা বিস্তার করলেন, যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সহ পঙ্গু বিহ্বল কীর্ত্তন বিলাসী শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবে উন্মাদ অধীর, সুরধনী গঙ্গাতটের সেই নব দিব্য শিশু শ্রীজগদ্বন্ধু মহাপ্রলয়মুখীন জগতের পরম বন্ধুরূপে সৃজন পালন প্রলয় সংঘাত বিক্ষুব্ধ রাহুগ্রস্ত দুর্দ্দিনে অতি রহস্যময় পরমাশ্চর্য্য মহোচ্চারণমূলক মহামন্ত্র গ্রথিত শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতের উদ্বোধন করলেন—ঐটি হচ্ছে দেবনরগন্ধর্বনন্দিত—দিব্যলোকে মর্ত্ত্যলোকে দীক্ষা ভিক্ষার আর কিছু অবশিষ্ট নয় অতঃপর। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর রচিত পাদটীকার উল্লেখে এই প্রবন্ধের উপসংহার হল। যথা—

"সেই লাবনী উচ্ছাসে, কীট মোক্ষন,
তাই মাটিতে চাঁদ উদয় ভেল॥
আব্রহ্ম স্তম্ব ভাবরাগ রঞ্জিত
মহীন্দির যে কীট সে কীট শেল॥"

জয়তু হরিপুরুষ, জয়তু শিশুরাজ, জয় জগদ্বন্ধু।
"তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া॥"

—:০:—

তুলসীদাস ঃ

[জগদ্বন্ধু-বার্ত্তার ১৩শ বর্ষ অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যার পর হইতে]

[একুশ]

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত "রাম চরিত মানস" বিশ্ব সমাদৃত এক মহাকাব্য। ভারতীয় সংস্কৃতির উহা মধুচক্র। এই কাব্যের বলেই হিন্দী সাহিত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সাথে স্পর্দ্ধা করতে সমর্থ। ভারতীয় জীবনধারা এই "রাম চরিত মানস' এ পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেছে।

'কবিতাবলী 'গীতাবলী' আর 'কৃষ্ণগীতাবলী' কবি তুলসীদাসের মনোরম রসপূর্ণ রচনা। 'বিনয় পত্রিকা'তে কবি তুলসীদাসের দার্শনিকরূপ উচ্চস্তরের কবিত্বে পরিণত। ভক্তি আর সঙ্গীতের জন্য এ যেন সরোবর।

তুলসীদাসের রচনা কালে, সমসাময়িক সকল প্রকার রচনা শৈলীর প্রণয়ন করে সর্বগ্রাহী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অবধী ও ব্রজভাষার উপর তুলসীদাসের সমান অধিকার ছিল।

তুলসীদাসের প্রতিভা সর্বতোমুখী। রামায়ণ আর ভারতের পর আমাদের দেশে ভারতীয় জীবনধারার সর্বোত্তম অভিব্যক্তি 'রাম চরিত মানস'এ অন্তর্নিহিত। তুলসীদাস এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন স্বীয় সুখ তরে। ধর্ম, দর্শন সমাজ, নীতি কাব্য কলা আদি সকল প্রকার দৃষ্টিতে অভূতপূর্ব কাব্য সৃষ্টি তাঁর এই রামচরিত মানস।" তুলসীদাসের রচনায় সকল রসের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। শৃঙ্গার রসে যেরূপ শিষ্ট মর্য্যাদা পূর্ণ বর্ণনা তুলসীদাস করেছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। তুলসীদাসের প্রবন্ধ রচনা পটুতা ও কথার মর্ম পরিচয়ের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। পাত্রের মনোভাবের সূক্ষ্ম অঙ্কন হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যতার দৃশ্য অঙ্কন তুলসীদাসের অন্যতম কীর্তি।

রামের শীল, শক্তি আর সৌন্দর্য্য তুলসীদাস তুলে ধরেছেন দেশের সামনে। তুলসীদাস ছিলেন ভক্ত, তাঁর রচনায় ছিল সেই ভক্তিরই পবিত্র ধারা। তাঁর ভক্তি পদ্ধতি কর্ম এবং জ্ঞানের সাথে প্রবাহিত।

তুলসীদাস ছিলেন যুগ নির্মাতা এবং ক্রান্তদর্শী কলাকার। উত্তর ভারতে শৈব বৈষ্ণবের যে সঙ্কীর্ণতার কলহ তা তুলসীদাসের প্রভাবেই বন্ধ হয়েছে।

তুলসীদাসের কীর্তিকলা উত্তর ভারতের জনতার উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করেছে।

কবিতার জন্য তুলসীদাস কবিতা রচনা করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে কবিতা হওয়া চাই গঙ্গার মত মঙ্গলময়ী।

তুলসীদাসের দৃষ্টি কেবল লোকরঞ্জন ছিল না, ছিল লোক মঙ্গল। লোক সংগ্রহের ভাব তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে অন্তর্নিহিত। মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের ভক্ত হয়ে তুলসীদাস সমাজের সামনে যে উদাত্ত আদর্শ রেখেছেন তাঁর প্রকাশ আজও জগতে দীপ্যমান।

তুলসীদাসের ভাবপক্ষ ও কলাপক্ষ দুইটিই ছিল সুদূর প্রৌঢ়। তাঁর ভাষায় ওজ, প্রসাদ ও মাধুর্য্য এই তিন গুণের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন অবধী ভাষার মিষ্টতা তেমনি অপর দিকে সংস্কৃতের কোমলকান্ত পদাবলীর নূতন ছটা দৃষ্টিগোচর হয়। ভাষা সর্ব্বত্রই ভাবের অনুগমন করে। গ্রাম্য ও লৌকিক ভাষার প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর রচনার মধ্যে। প্রচলিত বিদেশী ভাষার প্রয়োগ করেও তিনি মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন।

জীবনী লেখক—ডাঃ লক্ষ্মীরঞ্জন কর্ম্মকার, পরাশিয়া, ছিন্দওয়াড়া, মধ্যপ্রদেশ।

তাঁর ভাষায় রয়েছে প্রবাহ আর ধ্বনি সৌন্দর্য্য। কোথাও শব্দের মধ্যে রসোচিত ধনুষ্টঙ্কার আর কোথাও বা শান্ত এবং শৃঙ্গার রসের উপযুক্ত বীনার মধুর ঝঙ্কার দৃষ্টি গোচর হয়। ভাষার এমন সমৃদ্ধ প্রয়োগ আর সৌষ্ঠব তিনি সর্বপ্রথম অবতরণ করেন হিন্দী সাহিত্যে। ব্রজভাষার সংস্কার করা হল। নানাবিধ ছন্দ ও বিবিধ রাগরাগিনী তুলসীদাস তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কত রকমের অলঙ্কার ছড়িয়ে আছে তুলসীদাসের কাব্যের মধ্যে।

অখিল মানব জাতির জন্য শুভ বার্ত্তা বহন করে এনেছে তুলসীদাসের কাব্যগুলি। এই ধরণী স্বর্গ হতে পারে। সেই স্বর্গে রামরাজ্যের দৃশ্য তুলসীদাস তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। অতুল সম্পদের অধিকারী হতে পারে মানব সমাজ। সকলে সুখী হোক, সবাই নীরোগ হোক, সবাই সুন্দর হোক—তাই ছিল তুলসীদাসের সুন্দর স্বপ্ন, তাই ছিল তুলসীদাসের আদর্শ। এই সব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে—ত্যাগের দ্বারা। গোস্বামী তুলসীদাস যে

হিন্দু গৃহস্থের দৃশ্য 'প্রস্তুত করেছেন, তার মূলে ত্যাগ ও পরদুঃখ কাতরতা ভাব রয়েছে। মর্য্যাদা, শীল, সদাচার, সত্য এবং শক্তির বল পরই রাষ্ট্র উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে। তুলসীদাসের কীর্ত্তিকলাপ আজও যে কোনও দেশের নৈতিক স্তর উচ্চতর করাতে পারে। তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে ভারতীয় জীবনে শক্তি এবং সাহসের সঞ্চার করে আছে।

আকবরের মহান্ বিজয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ জীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু 'রামচরিত মানস'-এ সুরক্ষিত সীতারামের যুগল মূর্ত্তি আজও জনতার মানসপটে দেদীপ্যমান।

দলিত ও পীড়িত জনতার পক্ষ নিয়েছিলেন তুলসীদাস। তাদের ভিতর আত্মগৌরব ও শক্তির ঝঙ্কার করেছেন। এক মৃত জাতি নবীন তরুণতার সাথে আলস্য ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভারতীয় জনতার অনন্ত ব্যথা তুলসীদাসের কাব্য প্রেরণার স্রোত। সেই স্রোতে তরঙ্গায়িত কবির বাণী অনন্ত বেগ আর বলে প্রবাহিত।

তুলসীদাসের পটভূমি ছিল বিস্তৃত। কবির জন্ম, মরণ, হর্ষ, বিষাদ, জয়, পরাজয়, সব কিছুরই অমর ক্ষণ কথায় গুঞ্জরিত। এই কারণে সমস্ত ভারতীয় জনতার উপর তুলসীদাসের ব্যক্তিত্বের এক অপূর্ব্ব ছাপ নিহিত।

সংস্কৃতে বাল্মীকি, বেদব্যাসের মতই ছিল তুলসীদাসের স্থান হিন্দী সাহিত্যে। তুলসীদাস তাঁর নিজের বিরাট প্রতিভা, কবিত্ব শক্তি এবং ভক্তির মঙ্গলময়ী ভাবনার কারণ হিমগিরির অতুঙ্গ শিখরের সর্ব্বজয়ী ব্যক্তিত্বের জন্য অপরাজেয়ভাবে দণ্ডায়মান।

॥ সমাপ্ত ॥

বন্ধুভক্ত বন্ধুকিশোর / সত্যবন্ধু ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অন্তঃ কক্ষের এক চিহ্নিত সহচর (পরিকর) ছিলেন শ্রীমদ্ বন্ধুকিশোর ব্রহ্মচারী। প্রভুর এষণা নির্দ্দেশনা নিয়েই তাঁর আবির্ভাব। শ্রীভগবানের নিত্য সহচর যাঁরা তাঁরা সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের সভার সাথী হয়েই থাকেন। যখন যখন শ্রীভগবান মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হন

তখন তখনই তাঁর নিত্য পরিকরবৃন্দ তার লীলার প্রকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিবিস্তৃতির জন্য অনতিপূর্ব্বে সঙ্গে ও অনতিবিলম্বে জগতে জন্ম পরিগ্রহ করে শ্রীভগবানের লীলার পূর্ণতা, সুষ্ঠুতা ও প্রসারতা দান করেন। কেউ কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন; ভক্ত আবার কি করে ভগবানের লীলার পূর্ণতা ও প্রসারতা দান করেন। ভগবানই তো সর্বশক্তিমান; উত্তর :— ভক্তকে নিয়েই ভগবানের ভগবত্ব; ভক্তের সঙ্গেই ভগবানের লীলা ও ভক্তের মাধ্যমেই ভগবানের লীলার প্রকাশ। একত্বে লীলা হয় না। একের বহুত্ব, এককত্ব ও একক সর্বসমষ্টিত্বের মাঝেই তার পূর্ণ লীলার প্রকাশ।

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তুপতাড়া গ্রামে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রখ্যাত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৩২৫ সালে রাস পূর্ণিমা দিবসে শ্রীবন্ধুকিশোর ব্রহ্মচারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীজগৎ কিশোর রায়চৌধুরী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মুড়াপাড়া জমিদার গৃহের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। জগৎকিশোর বাবু নারায়ণগঞ্জে ডিস্পেন্সারী করে সেখানে সপরিবারে অবস্থান করত: চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। ঐ সময় জগৎ কিশোর বাবুর সহধর্মিনী শ্রীমতী সবাসনা দেবী (শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী যাকে ঢাকেশ্বরীর মাতা বলে ডাকতেন) সন্তানসম্ভবা হন।

রাসপূর্ণিমার ৪/৫ দিন পূর্বে সবাসনা দেবীর প্রসব যন্ত্রনা দেখা দেয়। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজিতেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী (হরিদাসদা) ধাইয়ের সন্ধানে যান। নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেওভোগ গ্রামে পার্নবিবি নামে এক মুসলমান ধাইমাতা ছিলেন। তার নিকট যেতেই তিনি বললেন; আজ বাড়ী ফিরে যাও আগামী রাসপূর্ণিমার দিনে আসবে। এবার এক অতীব সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান আসবে। ধাইমাতার কথায় জিতেন্দ্র কিশোর বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ী এসে দেখেন সত্যই সবাসনা দেবীর সেই প্রসব বেদনা প্রশমিত হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবে সংসারের সমুদায় কর্ত্তব্য কর্মাদি নিজ হাতে করছেন।

রাসপূর্ণিমার দিন পুনঃ সবাসনা দেবীর প্রসব যন্ত্রনা দেখা দেয়। আজও জিতেন্দ্র কিশোর ধাইমাতার সন্ধানে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হন। জিতেন্দ্র কিশোর যেতেই ধাইমাতা আজ পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত হয়েই বসেছিলেন।

তিনি তার সঙ্গে রওনা হলেন।

যথাসময় নির্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ৬।৭ মাস পরে শিশুকে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে নিয়ে তার মুখে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মহাপ্রসাদ দেওয়া হয় (অন্নপ্রাশন) এবং নাম রাখা হয় বন্ধুকিশোর রায়চৌধুরী। ঐ সময় শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দর দীর্ঘ ১৬ বছর ৮ মাস মহাগম্ভীরায় অবস্থান করে সেখান হতে বাইরে পদার্পন করেছেন।

শিশু বন্ধুকিশোর অতীব যত্নের সাথে লালিত পালিত হতে লাগলেন। বাড়ীতে রোজই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহানাম কীর্ত্তন হতো। মাত্র সাত বছরের বন্ধুবিশোর কীর্ত্তন শুনতে শুনতে নিজে সুন্দর তাল মানে কীর্তন করতে ও মৃদঙ্গ বাজাতে শিখে ফেলে। মৃদঙ্গ বাদ্যে ইতিমধ্যে সে এমন পটু হয় যে গ্রামে কোথাও পদাবলী কীর্ত্তন বা পালা কীর্ত্তনাদির আয়োজন হলে বালক বন্ধুকিশোরকে মৃদঙ্গ সঙ্গদ করবার জন্য নিয়ে যেতেন এবং তার মৃদঙ্গ সঙ্গদ শুনে উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হতেন।

কিছুদিন পর জগৎকিশোর বাবু সপরিবারে ডুপতাড়ার বাড়ীতে চলে আসেন। ১৩৩৬ সালে শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমার দিন জগৎকিশোর বাবু ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে বন্ধুকিশোর একদিন সকলকে ডেকে বললেন; "আমি আর আমিষ খাব না।" সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিশু বললেন; "প্রভু আমাকে রাত্রে এসে আমিষ খেতে নিষেধ করেছেন" প্রথমে কয়েক দিন অভিভাবকবৃন্দ তাকে আমিষ খেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শিশু প্রত্যহই ঐ একই কথা বলতেন। "প্রভু আমাকে রাত্রে এসে আমিষ খেতে নিষেধ করেছেন।" তারপর আর অভিভাবকবৃন্দ তাকে আমিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেননি। এর পর হতে প্রায় প্রত্যেক দিনই সকলে কৌতুহল বশতঃ বালক বন্ধুকিশোরকে নিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করতেন যে রাত্রে প্রভু তাকে কি কি কথা বলেছেন। বালক সকলকে তা বলতেন না। নির্জনে শুধু মাকেই তা বলতেন। মা এসে আবার সকলকে তা জানিয়ে দিতেন।

এর পর হ'তে গোটা পরিবারের সকলেই তাদের গৃহকর্ম সম্বন্ধে সকল আদেশ নির্দেশ বালক বন্ধু কিশোরের নিকট হতে নিতেন। বালক মাঝে মাঝে কিছু অলৌকিক বাণীও বলতেন। একদিন সকালে বালক বন্ধু

কিশোর মাকে বললেন; পাঁচ হাত দীর্ঘ কালী মূর্তি বানিয়ে পূজা দিতে প্রভু আদেশ করেছেন। এবং বলেছেন পূজা না দিলে নিজেদের এবং গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হবে। এই সময় তাঁদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। এই সংবাদ মায়ের নিকট হতে শ্রবণ করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্র কিশোর বিশেষ বিরক্ত বোধ করলেন। এই সমস্ত একটা উৎপাতই মনে করতে লাগলেন এবং কথাটি উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন। এদিকে মাতা এ বিষয় বার বার জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্র কিশোরকে তাগিদ দিতে লাগলেন। মাতার মনস্তুষ্টির জন্য জিতেন্দ্র কিশোর এক ভাস্করের নিকট গিয়া এরূপ মূর্তি তৈয়ার করতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে ভাস্কর মূর্তি তৈয়ার করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন আমি কোনদিন শুনিনি যে পাঁচ হাত কালী মূর্তি করে পূজা দেওয়া যায়।"

শ্রীজিতেন্দ্র কিশোর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করলেন, এই কথা শুনে মাতা খুব নিরুৎসাহিতা হয়ে পড়লেন। এইভাবে কয়েকদিন যায়। একদিন সবাসনা দেবী হঠাৎ দেখলেন পার্শ্বের গ্রামের একজন কারিগর তাদের বাড়ির নিকট দিয়ে যাচ্ছেন। সবাসনা দেবী ভাস্করকে ডেকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং সমস্ত ঘটনা তাকে বিস্তৃতভাবে বলেন। ভাস্কর সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে মূর্তি তৈয়ার করতে রাজি হন। এই সময় প্রভুর আদিষ্ট পূজার দিনের মাত্র পাঁচ দিন বাকি। কারিগর নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে মূর্তি তৈয়ার নির্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। মাত্র কয়েকটি বাঁশ দিয়ে অতি হাল্কা একটি চালা ঘর তৈরী করে তার মধ্যে প্রতিমা তৈয়ার করা হয়েছিল। প্রতিমা সম্পূর্ণ তৈয়ার হওয়ার পর এক প্রচণ্ড বেগে ঝড় শুরু হয়। এই ঝড়ে নিকটবর্ত্তী বৃহদাকার বৃক্ষাদি ভূপাতিত হলো। অনেকের বেশ মজবুত মজবুত বাসগৃহও ধ্বসে গেল। ভাস্কর মায় সকলে খুব নিরাশ হয়ে গেলেন। তাদের ধারণা এই প্রবল ঝঞ্ঝায় চালাঘর সমেত মূর্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঝড়ো হাওয়া বন্ধ হলে সকলে এসে দেখলেন, সেই চালাঘরের (পূজামণ্ডপ) একটি খড়ও নড়ে নি। সবই নিখুঁতভাবে বিদ্যমান। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করে সকলে ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠলেন।

এদিকে জিতেন্দ্র কিশোর পূজার বাসনপত্র আসবাবপত্র ইত্যাদি কিনতে

নিকটবর্তী বাজারে গিয়েছিলেন। কিন্তু এইরূপ প্রবল ঝঞ্ঝা বাত্যা দেখে তিনি কিছু খরিদ না করেই ফিরে এলেন। কারণ তার ধারণা হয়েছিল এইরূপ ঝড়ে সেই ছোট্ট চালাঘরের মত অতি হাল্‌কা মণ্ডপ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তিনিও বাড়ী এসে এই ঘটনা দেখে বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলেন, ঐ ঝড়ের সময় বালক বন্ধুকিশোর শ্রীশ্রীপ্রভুর আসনের নিকট আসন করে ধ্যানে বসে ছিলেন।

যথাসময় সুন্দর সুষ্ঠু ভাবে মায়ের পূজা সুসম্পন্ন হলো। পূজার পর সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কিছুদিন পরে বালক বন্ধুকিশোরের উপনয়ন সংস্কার করা হয়। উপনয়নের পর হতে বালকের মনে ধীরে ধীরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তারপর একদিন বন্ধুকিশোর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর নিকট হতে বৈষ্ণব সংস্কার (ভেক) গ্রহণ করেন। তখন তার নামকরণ হয় বন্ধুকিশোর ব্রহ্মচারী। সেই হতে তিনি একজন মহানাম সম্প্রদায়ভুক্ত চিহ্নিত সাধু। তিনি সঙ্গীত ও বাদ্যের উপর খুব অনুরাগী ছিলেন। শ্রীমদ বৃন্দাবন ব্রজবাসীর নিকট হতে তিনি লীলা কীর্ত্তনাদি শিক্ষালাভ করে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তনীয়ারূপে সকলের নিকট পরিচিত হন। সঙ্গীত চর্চাই তার সারা জীবনের প্রধান সাধনা ছিল। তিনি আমাদের সকলের অতি প্রিয় অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুকিশোরদা রূপে সুপরিচিত ছিলেন।

বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরীতে 'শ্রীশ্রীমহাপ্রকাশ মঠ' বন্ধুকিশোর দা'রই প্রতিষ্ঠিত। চন্দননগরে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম ও দেওঘর চরকী পাহাড়ে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম তারই প্রতিষ্ঠিত।

সারা জীবন তিনি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর সদা হাস্যময় ব্যবহার ও অনাড়ম্বর জীবন সকলের নিকট বড় আকর্ষনীয় ছিল। তিনি ছিলেন সংস্কার মুক্ত মানব। সমাজের সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মাঝে তিনি কোনদিন আবদ্ধ ছিলেন না। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমান সৌহৃদ্য। ক্ষণিকমাত্র তিনি যাঁর সাথে মিলেছেন বা ব্যবহার করেছেন, সারা জীবন তিনি এই উদার প্রাণ মিষ্টভাষী সাধুর কথা ভুলতে পারতেন না। সেই সর্বজন প্রিয় বন্ধুকিশোর দা আজ আর

আমাদের মধ্যে নাই। তিনি বিগত ৫ই কার্তিক মঙ্গলবার শুক্লা দ্বিতীয়া ব্রাহ্ম মুহূর্তে ইহলোক ত্যাগ করে তাঁর সাধনোচিত বন্ধুলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালীন তার বয়স হয় ৬১ বছর।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের রাতুল চরণে তাঁর বিগত আত্মার পরাশান্তি-পরাগতি প্রার্থনা করি।

॥ ওঁ জয়তু বন্ধুহরি ॥

এক ও অনেক / শ্রীকিরণ চন্দ্র বসু

সৃষ্টির উদ্ভব বৈষম্যে—'বৈষম্যম্ সৃষ্টি'।

প্রথমে সব কিছুই ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন তমসায় আবৃত—'অসিদিদং তমোভূতং'। না ছিল তখন সূর্য, না ছিল আলো—না ছিল দৃশ্য, না ছিল দ্রষ্টা—না ছিল বোধ, না ছিল বোদ্ধা। সব কিছুই লুপ্ত একাকার। তারপর একদিন সে আঁধার বিদীর্ণ করে ফুটে উঠলো আলো—জেগে উঠল নানা রংয়ের, নানা আকারের বিচিত্র বিভিন্ন ছবি। সৃষ্টির উন্মোচন হ'ল স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে—প্রভাতের সূর্যোদয়ে যেমন করে চরাচর প্রকাশিত হয় আপনাপন সত্তায়। এই ভেদ ও বৈপরীত্যের (contrast) মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তু ও প্রাণীর পরিচয়।

বিশ্ব বিধানে প্রত্যেকটি বস্তু বা জীব স্বতন্ত্র স্বরূপ এবং নিজস্ব স্বভাব নিয়ে জন্মায়। এ' কারণে একের সংগে অন্যের মূলগত পার্থক্য ঘটে। এই বিভেদের জন্যই বস্তুসমূহের পৃথক অস্তিত্ব এবং জীবের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অভিব্যক্ত হয়।

প্রাণীজগৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারে জন্মিত। এর মধ্যে কতগুলি প্রাণী আকারে প্রকারে একই রকমের। এই একই রকমের প্রাণীগোষ্ঠীকে বলা হয় জাতি—আকৃতি গ্রহণাৎ জাতি। বিভিন্ন জাতির প্রাণীদের মধ্যে তো দুস্তর ব্যবধান আছেই, এমন কি একই জাতির প্রাণীদের মধ্যেও পরস্পরে নানা পার্থক্য বিদ্যমান। ডারউইন যেমন বলেছেন—"No one supposes that all

individuals of the same species are cast in the same actual mould" [Origin of Species—1900]

পরস্পরের এই বিভেদ আবার মানুষের মধ্যেই অত্যন্ত বেশী রকমে প্রকট। এর কারণ বিবর্ত্তণের ধারা মানুষ পর্যন্ত এসে অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। একান্ত-ভাবে দৈহিক (Biological) অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ অতিক্রম করে মানুষ উপনীত হ'ল মানসিক স্তরে। ফলে সে শুধু খেয়ে পরে আর বংশ বৃদ্ধি করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। সেদিনের সেই আদিম মানুষ দেহের ক্ষুধা মিটিয়েছে ফল, মূল আর পশুর মাংস খেয়ে, আর মনের ক্ষুধা মেটাতে গুহায় একেছে ছবি, মাটি দিয়ে বানিয়েছে পাত্র, গড়েছে পুতুল, তৈরী করেছে নানা প্রসাধন। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে বৃষ্টি কেন হয়, ভূমিকম্পের পিছনে আছে কোন্ রহস্য, কেমন করে দিনের পর আসে রাত্র? বিভিন্ন দিকের এই অনুসন্ধিৎসা মানুষের প্রয়োজনের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে—তার বাসনা কামনাকে করে তুলেছে অন্তহীন। নানা প্রয়োজনের বিভিন্নতার সঙ্গে বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব মানুষে মানুষে পার্থক্যকে আরও বেশী দুস্তর করে তাকে এক জটিল প্রাণীতে পরিণত করেছে। তার চাহিদা ক্রমে অপূরণীয় হয়ে উঠেছে। ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্ত হলেই পশুপক্ষীর পরম নিশ্চিন্ততা কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ অসম্ভব। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাস্সেল সুন্দরভাবে বলেছেন—"...human desires, unlike those of animals, are essentially boundless and incapable of complete satisfaction."

আবার মানুষে মানুষে এই স্বাভাবিক ব্যবধান থাকলেও তার মধ্যে প্রকৃতির একটি ঐক্যের অভিপ্রায়ও নিহিত আছে—"the Unity of man kind is eventually a part of Nature's eventual scheme" —Sri Aurobindo.

মনের ভাব প্রকাশ করবার মত ভাষা, অপূর্ব স্মৃতিশক্তি, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা প্রভৃতি গুণগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে স্থায়ী এবং সুদৃঢ় করেছে। মানুষ ক্রমশঃ ছোট থেকে বৃহত্তর ঐক্যে—পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজে আবদ্ধ হয়েছে। সহজাত এই গুণগুলির উৎকর্ষ সাধনকেই মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলে মেনে এসেছে।

কিন্তু বৈষম্যের মধ্যে শুধু ঐক্য নয় সাম্যও নয়— সামঞ্জস্য বিধানই সৃষ্টির

মূল সমস্যা। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন। পৃথিবীর রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি নানা ব্যবস্থায় এই সামঞ্জস্য বিধানেরই চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

আবার সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ যেমন ঐক্যবোধে সংঘবদ্ধ হ'তে পেরেছে তেমনি সমাজের মধ্যেই মানুষ অপরের সংগে নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেছে। এজন্য মানুষ দ্বৈতভাবে চালিত—একটি স্বার্থ আর একটি পরার্থ। এর সংগে আরও একটি ভাবও মানুষকে প্রভাবিত করে—তা' হ'ল পরমার্থ।

এই পরমার্থ চিন্তাই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অপূর্ব সামঞ্জস্যের পরম পথের সন্ধান দেয়। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনেরও এইটিই মূল কথা এবং চরম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধ তত্ত্ব হচ্ছে এই যে—সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড সত্তায় বিধৃত। সৃষ্টি যে সত্তারই আত্ম বিকিরণ। বৈদিক ভাবনায় সে সত্তার নাম ব্রহ্ম। তিনি পুরুষ এবং প্রজাপতি বলেও অভিহিত। সেই একই বহু হয়েছেন —'একং বা ইদং ভি বভূব সর্বম্' (ঋগ্বেদ, ৮।৫৮।২)। বহুরূপে তাঁর প্রকাশ—'রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূব' (ঋগ্বেদ, ৬।৪৭।১৮)। তিনি চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত—'ততো বিষঙ্ ব্যক্রামৎ (ঋগ্বেদ ১০।৯০।৪)। তিনি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ—সব শীর্ষই তাঁর শীর্ষ, সব চোখই তাঁর চোখ, সব চরণই তাঁর চরণ।

আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থ কুটীল যুযুধান অশান্ত পৃথিবীতে এই মহাভাবকে যদি আমরা আবার উপলব্ধি করতে পারি যে—প্রতি হৃদয়ের স্পন্দন, প্রতি জীবের যে নিঃশ্বাস, প্রতি ধমনীর যে রক্তপ্রবাহ তা' এক বিশ্বাত্মারই স্পন্দন, শ্বাস এবং প্রবাহ তা হ'লে আজকের সহস্র বিকৃতি, মনুষ্যত্বের বিপুল অমর্য্যাদা আর বিশ্বজোড়া এক মহতি বিনষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হতে পারব।

—:০:—

JAGADBANDHU-BARTA
Postal Reg. No. WB/BRS-12

জগদ্বন্ধু·বার্ত্তা

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)
মহাপ্রচারণে ১৪শ বর্ষ
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৮০
মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৬

প্রতি মাস ৬০ পঃ, বার্ষিক ৬-০০
মিশনের মহাদানে : (এককালীন / কিস্তিতে—২০, ৩০, ৫০, ১০০, ৫০০, ১০০০ টাকা ও তদূর্দ্ধে)

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি
শ্রীনরেন্দ্র লাল বসু
মিশন কমিটি উপদেষ্টামণ্ডলীর চেয়ারম্যান : প্রঃ ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, এম.এ, পি-এইচ-ডি
সম্পাদক :
শ্রীমাখন লাল ধর (বন্ধুসুন্দরানন্দ)
সহঃ সম্পাদক :
শ্রীকিরণ চন্দ্র বসু, এম.এ, এল্-এল্.বি
শ্রীকান্তিব্রত ভট্টাচার্য্য, এম.এ, বি.টি.
শ্রীসমর কান্তি ধর

জয়-জগদ্বন্ধু মিশন-ইণ্টারন্যাশনাল নিবাধুই, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা পঃ বঙ্গ (ভারত) হইতে শ্রীএম্ এল্, ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক বেঙ্গল আর্ট প্রিণ্টার্স কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

EDITOR
BANDHU SUNDARANANDA

WAY to Mission 3 minutes walk—direct north side from Duttapukur Rly. Station, (by overbridge) Bongaon Line (E. Rly.) (Enquiie at Stn. Master)